জয়ন্ত চৌধুরী

.....

একটি শহিদবেদী ও একজন রাজমিস্ত্রীর ভাবপ্রবণতা

বৃষ্টি থেমে যায়। রাস্তার ওপারের গাড়ি বারান্দার তলা থেকে, দোকানের শেডের আশ্রয় থেকে আর পাশের ছোট্ট চায়ের দোকান থেকে পায়ে পায়ে ওরা বেরিয়ে আসে। ঘিরে দাঁড়ায় চট চাপা দেওয়া আধখানা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেদীটাকে। স্কুল বাড়ির ভেতরে আবদুলের সিমেণ্ট মাখা হাত শুকিয়ে গেছে। রেজা আর কচির দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই ওরা ওপাশ থেকে উঠে আসে। বারান্দার তলার সিমেণ্ট মাখার জায়গাটায় এগিয়ে যায়। কচি, অর্থাৎ দলের সবচেয়ে কম বয়সের যোগানদার বাচ্চাটা কোদাল টেনে নেয়—মাখা সিমেণ্ট নাড়াচাড়া করতে থাকে। শক্ত চেহারার যুবক রেজা কচিকে ধমক দেয় আর আঁটো হয়ে আসা সিমেণ্টের দিকে তাকিয়ে বলে 'পানি নে আয়"। কচি বালতি হাতে চৌবাচ্চায় জল আনতে যায়। এতক্ষণে বিড়ি শেষ হয় দলের বয়োজ্যেষ্ঠ রাজমিস্ত্রি অভিজ্ঞ আবদুলের। কর্ণিকগুলো সিমেণ্টের শানে ঠুকে নেয়, গেট পার হয়ে হাজির হয় বেদীটার সামনে। সেখানে যুবকেরা চাপা-দেওয়া চটটাকে সরিয়ে অসমাপ্ত বেদীটার সম্ভাব্য আকার-আয়তন ও দৃষ্টি-আকর্ষণের ভূমিকা নিয়ে ছেঁড়াখোঁড়া কথাবার্তা বলছিল। ওদের একজন আবদুলকে প্রশ্ন করে,

'—আর কতক্ষণ লাগবে?

—আর পানি না পড়লে জলদি হবে।

—একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও ভাই, চারটে বেজে গেল—

—এ মেশিনের কাজ কি? হাতের কাজে টাইম তো লাগবেই।'

সিমেণ্টের কড়া নিয়ে হাজির হয় কচি। আবদুলের অভ্যস্ত চোখ মাপজোক দেখে নেয়। ইঁট তোলে, ভাঙে, স্তরে স্তরে গেঁথে দেয় তার দীর্ঘ জীবনের অর্জিত পেশাদারী দক্ষতায়। কঠিন এক নিয়মবশত যে হাতের নিবিড় বাঁধন থেকে একদিন কবে ঠিক্‌রে বেরিয়ে গিয়েছিল লাঙলের হাতল, আর কবেই বা কঠিনতর এক তাগিদবশত সে হাত চেপে ধরেছে কর্ণিকের গোড়া! তারপর

চল্লিশবছরময় জীবনের বাঁকে বাঁকে অসহ্যতা, ক্ষোভ আর শোক। এ সবের প্রবল সংঘাত সত্ত্বেও কোথায় যেন আপোসের রফা হয়ে গেছে জীবনের সাথে। স্থির, গম্ভীর এই মানুষটি তাই একটি শীর্ণগাছের মত বেঁচে আছে।

বালিমাথার কাজ শেষ করে একফাঁকে এই ভীড়ে জড়ো হয় রেজা। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে এক যুবক, বোধহয় তার ওপর ভার ছিল তদারকির, তার কাছে গিয়ে রেজা দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করে,

'—আপনারা এটা বানাতে লেগেছেন কেন?'

যুবক রেজার প্রশ্নে উৎসাহিত বোধ করে। সহজ ভঙ্গিতে সে বিবরণ দেবার চেষ্টা করে এক বছর আগেকার একটি ঘটনার। তার কথার স্বরে আন্তরিকতা,

'—এই যে আমরা—ছাত্ররা—যারা স্কুল কলেজে পড়ছি—তাদের ওপর যে দমন পীড়ন—আর কি নানারকমভাবে অত্যাচার চলছে—আমাদের দেশের শাসকরা যারা দেশটাকে চালাচ্ছে—তারাই এই অত্যাচার চালাচ্ছে। তা, আমরা গতবছর এইখানে একটা মিটিং করেছিলাম—একটা প্রতিবাদ-সমাবেশ, মানে আমরা সেখানে বলেছিলাম যে এই সমস্ত অত্যাচার, এই সব অন্যায় চলবে না—তখন একদল গুণ্ডা, যাদের শাসক পার্টি ভাড়া করে রাখে আমাদের মারার জন্য, তারা এখানে হামলা চালায়। ওরা বোমা ছোঁড়ে—একটা বোমা এসে লাগল আমাদের একজন কমরেড—একজন ছাত্র—তার মাথায়। সে শহিদ হয়। তাকে স্মরণ করেই আজকে আমরা এই শহিদবেদী তৈরী করছি, শহিদ দিবস পালন করছি।'

'—লোকটা বোমায় মরল, থানা-পুলিশ হলনি?'

যুবক এইবার হাসে। সে রেজাকে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে বলতে থাকে। রেজা অবাক হয় এবং প্রশ্ন করে, 'আপনারা কোন পার্টি?' যুবক আবার এগিয়ে আসে এবং রেজাকে বোঝায়—এটা কোন পার্টি নয়, এটা ছাত্রদের একটা সংগঠনমাত্র।

এখনকার প্রসঙ্গের কথাগুলি রেজার কাছে স্পষ্ট হয় না। এখানে হাওয়ায় উড়ছে লাল পতাকা, টান টান করে বারান্দার গায়ে টাঙানো হয়েছে লাল ফেস্টুন। অথচ বলছে—পার্টি নয়। যুবকেরা ততক্ষণে একপাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল পরবর্তী কাজগুলি নিয়ে। অন্যপাশে একাকী রেজা পিছিয়ে যেতে থাকে ওর শৈশবে। সেখানেও গঞ্জের হাটের তল্লাটে যুবকের ভীড়। লাল নিশান উড়ছে। জড়ো হয়েছে চাষাভুষো মানুষ বোঝা-না-বোঝার চোখ নিয়ে। যুবকদের ভীড়ের মাঝে ব্যস্ত আখতার চাচা।

আখতার চাচা হকের কথা বলত। জমির হক। আখতার চাচা লড়াইয়ের কথা বলত। বাঁচার লড়াই। আখতার চাচা একদিন চলে গেছে। কেউ জানেনা কোথায়। আখতার চাচা ফেরেনি। আখতার চাচা অর্থাৎ বৃদ্ধ আবদুলের ছোট ছেলেকে এইভাবে মনে পড়তে থাকে রেজার। আজকের এই জনবহুল পথের পাশে শহিদ দিবস পালন করতে সামিল হওয়া এই যুবকদের রেজার খুব পরিচিত বলে মনে হয়। আখতার চাচার সহকর্মী সেদিনকার সেই যুবকেরা এদের অস্তিত্বে মিশে যায় যেন। কিন্তু একদিন শিশুমনে স্নেহ দিয়ে আখতার চাচা যে স্থান দখল করেছিল, অচেতনে লালিত হয়ে হয়ে সে স্থানটুকু রেজার যুবামনের গভীরে গভীরে এখনও রয়ে গেছে। তাই রেজার অশিক্ষিত অন্তঃকরণ আখতার চাচার নিরুদ্দেশের জন্য একান্তভাবে দায়ী করতে থাকে এই যুবকদের। এদের কার্যকলাপ তার কাছে ভীষণ অন্যায় বলে মনে হয়। এই অবস্থায় তার ভূমিকা কী হবে সে ভেবে পায় না। শেষ হতে থাকা শহুরে বিকেলে নিজের মধ্যে খেলে যাওয়া এই ভাবপ্রবণতাটুকু তার অসহ্য বোধ হয়। ওই বোমায় মারা যাওয়া ছেলেটার জন্য কি সে শোকার্ত হচ্ছে? এত ভারী লাগছে এই বাতাস! আখতার চাচা হয়ত একদিন বোমায়—না—এই যুবক তার ব্যক্তিগত জীবনবোধে এইসব মৃত্যুর কোন প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পায় না। মৃত্যুগুলি তার কাছে কোন মহত্বের রূপ নিয়ে আসে না। তবু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছে সে। এই শহিদ বেদী নির্মাণপর্ব, শোকজ্ঞাপন-সভা—এসবের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত হয় অচেনা এক যুবকের মৃত্যু আর সাথে সাথে আঁকা হতে থাকে আখতার চাচার মৃত্যুর ছবি। আশ্চর্যভাবে রেজা আখতার চাচাকে এই স্মরণ-সভায় একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকায় নিয়ে আসে। আখতার চাচাকে ঘিরেই এই সমাবেশ, সভা, আয়োজন, শহিদবেদী……

'—রেজা, বালি আন রে', বৃদ্ধ আবদুল ডাকে। ওর হাত চলছে সহজ অভ্যাসে। রেজা বালির কড়া নামায়। তারপর একপাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে থাকে আবদুলকে। নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই অভিজ্ঞ বৃদ্ধের কাজের কৌশলগুলি লক্ষ করে যাওয়া ওর এক নেশা। এটা ওকে করতেও হয়। কারণ জীবিকার এই মাধ্যমটি বেশ প্রতিযোগিতাময়। সেরা হাতের কাজকে উত্তরাধিকারসূত্রে বাঁচিয়ে রাখতে হয় পেটের তাগিদে। আজ কিন্তু রেজা এই প্রশিক্ষণটুকু অবহেলা করতে থাকে। ও তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধের কর্মরত চোখদুটোর দিকে। রেজা জানতে চায় আবদুলের অন্তরের ভাবনাকে। নানা কি জানেনা ও কী গড়ে দিচ্ছে ওর নিপুণ কর্মদক্ষতায়? ও কি শোনেনি

বোমায় মারা যাওয়া ছেলেটার কথা ? নানার কি মনে পড়ছে না নিখোঁজ আখতার চাচাকে ? ওর চোখের মধ্যে এসব কোন ভাবনারই হদিশ পাওয়া যায় না। .

বেলা শেষের সাথে সাথে কাজ শেষ করে আনে আবদুল। কচিটাও পাশের দেওয়ালে সিনেমার পোষ্টার দেখছে। আবদুল চোখ তুলে তাকায় রেজার দিকে, ওর এই দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে বোধহয় কোন বিপন্নতাকে আবিষ্কার করে ফেলে তার বৃদ্ধ চোখ, 'কীরে দাঁড়ায়ে পড়লি যে!' রেজা নিজেকে ফিরিয়ে আনে, সহজ হবার চেষ্টা করে এবং ততোধিক বিপন্নতায় উচ্চারণ করে, 'কাল বাড়ি যাব নানা।' বৃদ্ধ যুবকের অন্তবর্তী বিপর্যয়টুকু টের পায় এবং আশ্চর্য হয়। সারাদিনের এই কর্মক্ষেত্রে কোন ঘটনাই সে খুঁজে পায়না যার নাটকীয়তার মাত্রা এই পরিশ্রমী যুবকটিকে এক প্রবল নাড়া দিয়ে যেতে পারে। ও বুঝতে পারেনা শহরের অপরাহ্নের এলাকায় এই বায়ুমণ্ডল জুড়ে হঠাৎ কী পরিবর্তন ঘটে গেল যার ফলে যুবকের চোখে ভেসে যাচ্ছে দূরস্থ ঘরবাড়ি-মাঠঘাট-আকাশ-পৃথিবী আর চেনা মানুষেরা। এই গৃহকাতরতা ওর পছন্দ হয়না। কাজ করে বাঁচতে হলে এই শহরের বুকেই ধান্দা বুঝে নিতে হয়। আঠেরো টাকা রোজের দিনগুলিকে খুঁজে পেতে হলে এখানেই জ্বালিয়ে রাখতে হবে চোখ। রেজার এই শহরবিমুখতা তার পক্ষে ক্ষতিকর। এই মানসিক দুর্বলতাকে বরদাস্ত করতে পারেনা সে। কঠিন হয়ে উত্তর দেয়, 'বাড়ি গেলে চলবে কি ? কাল নতুন কাজের কথা হয়ে আছে। আর বাড়ি যাবে, খাবে কী ? ধানু মোড়লের চেয়ে চারটি খড় মেঙে খাবে কি ?' এইসব কথার পর রেজাকে স্বাভাবিক হতেই হয়। কচিকে ডেকে নিয়ে বেদীর আশপাশে জমে থাকা ইঁট-বালি-সিমেন্টের অংশ ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকে। আবদুল উঠে ভেতরে যায় হাতমুখ ধুতে।

একসময় তিনজনেরই হাত-পা-শরীর সাফ হয় আর জামা-কাপড় পরা হয়ে যায়। রেজা চিরুণী দিয়ে চুল ঠিক করে। কচি ওর ভঙ্গিটি লক্ষ করে মনোযোগ দিয়ে। আবদুল কাঁধে ব্যাগওয়ালা যুবকটিকে প্রশ্ন করে, 'কী বাবু ? কেমন হল ?' সদ্যসমাপ্ত বেদীর দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বলে, 'ঠিক আছে।' সে পকেট থেকে টাকা বার করে। কিছু টাকা কম হয়। আবদুল বলে, 'ভাখেন, আপনার বন্ধুদের কাছে ভাখেন।' অন্য এক যুবক বাকি টাকাটা দেয়। আবদুল টাকাটা গোনে এবং লুঙ্গির গেঁজে রেখে দেয়। এরপর বেদীসংক্রান্ত দু-চারটে প্রশ্নের উত্তর দেয় সে। তারপর বলে, 'বোমা মেরেছিল যে, এখানেই

নাকি ?' ছেলেরা 'হ্যাঁ' জানাতে আবার হেসে বলে, 'ও বাপ ! এখন যদি আবার ফেলে !' ছেলেরা অল্প হাসে, বলে, 'না না, কিছু হবেনা।' এখন আবদুল অন্য দুজনকে ফিরে যাবার জন্যে ডাকে, 'চল বাদশারা, মোরা ঘরপানে যাই।'

আবদুলের এতক্ষণকার নির্লিপ্ত অনস্থির ভাব, টাকা নেওয়ার ব্যাপারে পেশাদারী পরিচয় এবং যুবকদের সাথে কথোপকথনটুকু—সবকিছুই অত্যন্ত কর্কশ মনে হয় রেজার কাছে। আজকের এই নির্মাণপর্বের মাঝে কোন স্মৃতিই কি আবদুলের মনে নাড়া দিয়ে যায়নি—কোন শোক কি তুলে আনা হয়নি হৃদয়ের অতল থেকে—এ সমস্ত কিছু রেজার অজ্ঞাত থেকে যায়। আবদুলের কাছে এই কর্মসময়ের মুহূর্তগুলি একান্তই তাৎপর্যহীন রয়ে গেছে—এই ভাবনা রেজাকে বিড়ম্বিত করে। নিজ জীবিকার কর্মমাধ্যমে দক্ষ এই মানুষটি দীর্ঘজীবনের কর্মের অভিজ্ঞতার সাথে সাথে আর কোন বোধ অর্জন করে গেছে, যা তাকে শিখিয়েছে এইরকম কঠিন অথবা সহজ, খুবই সহজ হবার এক কৌশল—এইসব ভাবনার মাঝে ফিরতে থাকে রেজা, ফিরতে থাকে আরও দুটি মানুষ, রাত্রির সঙ্কীর্ণ আশ্রয়টুকুর জন্যে। □

ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও লাইব্রেরিকে সম্পন্ন করে তোলার মতো
জগন্নাথ প্রামাণিক
রচিত দুটি গ্রন্থ ঃ

শিলাবতীর তীরে তীরে (উপন্যাস) ১৫·০০
চিত্ত-চরিত্র (ছোট গল্পের সংকলন) ২০·০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ
তারকনাথ বুক সিণ্ডিকেট
৬·বি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩